নিষিদ্ধ নজরুল ঃ সমকালে এবং অতঃপর

নজরুলের সমকালে সব চেয়ে বড় ঘটনা তাঁর দ্রোহাত্মক রচনার জন্যে তাঁকে বারবার কারাবরণ এবং তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে 'যুগবানী', 'বিষের বাঁশি', 'প্রলয়শিখা', ভাঙার গান' ও 'চন্দ্রবিন্দু' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে এক সঙ্গে গ্রন্থগুলি নিষিদ্ধ হয় নি। বিভিন্ন সময়ে এ সব গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'অগ্নিবীণা' বাজেয়াপ্ত করার সম্ভাবনা বেশী থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বইটি বাজেয়াপ্ত হয় নি। তবে পুলিশ বইটি বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে তুলে নিয়ে যেত। কারো হাতে থাকলেও পুলিশ তাঁর কাছে থেকে ছিনিয়ে নিত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশে নজরুল ব্যতিরেকে অন্য কোন কবিকে এতবেশী কারাবরণ করতে হয় নি। নজরুলের সমকালে তৎকালীন রাজনীতিকদের অনেকেই নজরুলের গান ও কবিতা থেকে প্রেরণা নিয়েছেন। এক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখদের নাম উল্লেখ করা যায়। বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশে নজরুল বোধ হয় একমাত্র কবি-সাহিত্যিক যার কাব্য-গান ইত্যাদিতে দেশপ্রেমজনিত বিদ্রোহ এবং দেশমুক্তি গান সর্বাধিক ভাবে প্রচারিত হয়েছে। সাংবাদিক হিসেবেও নজরুল দেশ-মুক্তির জন্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে শুধু যুক্তই ছিলেন না, তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় তিনি অকুতোভয়ে মুক্ত ভারতের কথা বারবার বলেছেন। এ কথা বলা তাই অত্যুক্তি হবে না যে সে সময়ের যে কোন রাজনীতিবিদ থেকে দেশমুক্তির জন্য নজরুলের কর্মকাণ্ড কোন মতোই ছোট তো ছিলই না, বরং বলা যেতে পারে, তাঁর কলমের শক্তি তরবারি অপেক্ষা অধিক শানিত এবং ক্ষুরধার ছিল। রাজনীতিতে 'ছলা-কলা' আছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যাই প্রবল। নজরুলের জীবনে রাজনীতিকদের সংস্পর্শে এসে তা ঘটেছিল। অবশ্য যাঁরা আদর্শবান এবং দেশমুক্তির জন্য লড়াই করেছেন এমনতর রাজনীতিকদের কথা আমি বলছিনা। রাজনীতিতে তিনি তথাকথিত রাজনীতিবিদদের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ নজরুলকে কখনো ভোলে নি। আজও তাঁর কবিতা ও গান মানুষের সমস্যা এবং সংকটে প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যেমন বলেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে, কারাগারে যেখানেই থাকিনা কেন নজরুলের গান আমরা

গাইবই। কবিরা দেশনায়ক হ'তে চান না। তাঁরা দেশনায়ক তৈরী করেন। 'কাণ্ডারী-হুশিয়ার' এই বিশ্বাসেরই সার্থক প্রতিফলন। আমরা ভেবে আশ্চর্য হই, নজরুল দেশের জন্য জাতির জন্য কারাবরণ করেছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, তাঁর গ্রন্থসমুহের অনেকগুলিতেই রাজদ্রোহের ইন্ধন থাকায় সে- গুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খুব ছেলেবেলা থেকেই নজরুল দেশপ্রেমী ছিলেন। শৈলজানন্দের বর্ণনায় আমরা তা দেখেছি। কিন্তু অনেক ঘটনা সেখানে আসে নি। এ প্রসঙ্গে মাহবুবুল হক বলেনঃ "সিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের শিক্ষক ও যুগান্তর দলের গোপন বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক নজরুলের মধ্যে স্বাধীনতা ও বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করেছিলেন। বিপ্লবী কর্মতৎপরতার জন্য নিবারণচন্দ্র গ্রেফতার হন (৮ জানুয়ারী ১৯১৭)। বিচারে এই শিক্ষকের পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগাযোগের সন্দেহে স্কুলের দশম শ্রেণির সেরা ছাত্র নজরুলের মাসিক ৫ টাকা হারে প্রাপ্ত বৃত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে ২০ জানুয়ারী ১৯১৭। (মাহবুবল হক, নজরুল তারিখ অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ৫)। কিন্তু পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ নজরুলের অভাব এবং মেধাবী হওয়ার কারণে এবং সরাসরি নিবারণ ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তার বৃত্তি অব্যাহত রাখা হয়। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে নজরুল কৈশোর থেকেই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে নজরুল পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যচর্চাকে বেছে নেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'সওগাত' পত্রিকায় সৈনিক জীবন থেকেই লেখা শুরু করেছিলেন। এক্ষেত্রে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকায় তিনি এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমদ যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লেখালিখি মূলতঃ নজরুলকেই করতে হ'তো। সাহিত্যচর্চায় 'মোসলেম ভারতের' সঙ্গে যুক্ত হলেও একুশ বৎসর বয়সে 'নবযুগ' পত্রিকায় নজরুলের সাংবাদিকতার প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল। মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথায় আমরা তা পেয়েছি।

অতঃপর ১লা আগষ্ট ১৯২০ ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা গঙ্গাধর তিলক মৃত্যবরণ করেন। সাহিত্যচর্চায় নজরুল 'নবযুগ' পত্রিকায় যোগদানের আগে 'মোসলেম ভারতে' লেখালিখি করতেন। নজরুল খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য। কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে' প্রথমে ছাপা হয় নি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী' পত্রিকাতে।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য সে সময় 'বিজলী' পত্রিকায় কাজ করতেন এবং নজরুলের কাছে থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি পেন্সিলে লেখা কপি নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। 'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি প্রথম ছাপা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয় নি। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সংগে সংগে নজরুল হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। চতুর্দিকেই তাঁকে নিয়ে মাতামাতি শুরু হল। কারণ এ ধরণের কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কখনো লেখা হয় নি।

শিশির কর তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুলে' লিখলেন "বিদ্রোহী-কবিতা? না আগুনের গোলা? প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রায় একসঙ্গে বের হল 'বিদ্রোহী'। সে এক চমকপ্রদকাহিনী। সেদিনের সেই কথা নজরুল - বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের ভাষায় ঃ "বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৩২৮ সালের পৌষমাসের প্রথমার্ধে। কিন্তু তথ্যান্বেষী দেখবেন- 'বিদ্রোহী'র প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'। সুতরাং তিনি ভেবে দেখবেন, তা হলে বিদ্রোহী ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের আগেকার রচনা। ব্যাপারটা এই যে, সে সময় 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত প্রতি মাসে বেরত না। ঐ কার্তিক সংখ্যাটি বেরিয়েছিল পৌষের শেষের দিকে।" (শিশির করঃ নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ ৫)

বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের সাথে সাথে সারা বাংলাদেশ ও বাঙালীদের মধ্যে উৎসাহের বন্যা ছড়িয়ে গেল। কে এই নজরুল? অবশ্য 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'ভাঙার গান' ইত্যাদি প্রকাশ পেলে নজরুল বিস্ময় সৃষ্টি করেন। মাত্র একুশ বছর বয়েসী একজন তরুণ এমন একটি কবিতা লিখতে পারেন--পূর্বাপর বাঙালী সমাজে তার দেখা পাওয়া যায় নি। এমন কি মাইকেল মধুসুদন কিংবা রবীন্দ্রনাথ কারও রচনায় এমন বৈপ্লবিক চেতনা আদৌ দেখা যায় নি। 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন ঃ 'কাব্য - বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে। কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ-কথা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করবেন না।" (প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল স্মৃতি ঃ পৃ. ৩)

পরিমল গোস্বামী বললেন ঃ "অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোন বাঙালী কবি চ্যালেঞ্জ জানান নি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে তো শুনিনি। Must fight to fresh মন্ত্রে দীক্ষিত আর কোন বাঙালী কবি শত্রু পক্ষকে এমন আহ্বান জানান নি। (পরিমল গোস্বামী, আমি যাদের দেখেছি, পৃ. ২৮৪)

শিশির কর লিখলেন ঃ

"রাজশক্তি স্বভাবতই সচকিত হয়ে উঠল। সব রকম অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কে এমনিভাবে গর্জে উঠেছে? বিদ্রোহীর লেখক কে? রক্তচক্ষু সরকারি আমলারা বেসামাল। আমলাদের সঙ্গে গোয়েন্দারা, সরকারি আইনবিশারদরা তৎপর হয়ে উঠলেন। কোন আইনেই তো বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।" (শিশির করঃ নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ.৮৯)

বস্তুত, 'বিদ্রোহী' ছিল পৃথিবীর তাবৎ শোষিত মানুষের মনের ভাষা। নজরুল তাদের সেই কষ্টকে রক্তের ভাষায় লিখে গেলেন। এখানে তিনি দুই ধর্মকে টেনে এনেছেন ঠিকই। কিন্তু তা কেবল প্রতীকি শব্দের আড়ালে সত্যকে প্রকাশের জন্য। এখানে দুই ধর্ম আদৌ মুখ্য নয়। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেনঃ "এ কবিতায়

হিন্দু মুসলমান দু'জনেরই এত পুরান প্রসঙ্গ ঢুকেছে যে বৃটিশ সরকার সরাসরি একে রাজদ্রোহী বলে চিহ্নিত করতে পারল না। কখনো ঈষাণ-বিষাণের ওঙ্কার বাজছে, কখনো বা ইস্রাফিলের শিঙ্গা থেকে উঠছে রণ হুঙ্কার।

কখনো বা হাতে নিয়েছে মহাদেবের ডমরু-ত্রিশুল কখনো বা অর্ফিয়াসের বাঁশি। কখনো বাসুকীর ফণা জাপটে ধরেছে। কখনো বা জিব্রাইলের আগুনের পাখা, কখনো চড়েছে "তাজি বোররাকে (পক্ষীরাজ ঘোড়া) কখনো বা উচ্চৈঃ শ্রবায়। একে রাজদ্রোহ বলতে গেলে ধর্মের উপর হাত দেওয়া হবে।" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ঝড়ের কবিতা, পৃ. ১৯)

কিন্তু তা হলে কি হয়। ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মরত বাঙালী বিশ্বাসঘাতকেরা তো বসে নেই। কিছুদিনের মধ্যে প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হলো, তার নাম 'যুগবাণী' -- নজরুলের 'নবযুগে' লেখা সমূহ নিয়েই যুগবাণী প্রকাশ পেয়েছিল। 'দৈনিক নবযুগ' ছিল শেরে বাংলা ফজলুল হক এর সান্ধ্য পত্রিকা। ২২নং টার্ণার স্ট্রীটে 'নবযুগ' এর ছাপাখানা এবং ৬নং টার্ণার স্ট্রীটের নীচের তলায় দু'খানা ঘর নিয়ে 'নবযুগ পত্রিকা'র অফিস। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদের নাম ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নজরুলের দেওয়া হেডিং এর জন্যেই 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর চাহিদা মেটানো যেত না।

'নবযুগ' ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উস্কিয়ে দিচ্ছিল এবং সেই সাথে কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষদের পক্ষে দাবী আদায়ের কথাও বলতেও পিছ্পাও হয়নি। এর ফলে 'নবযুগ' সরকারের রোষানলে পড়ে এবং 'নবযুগের' জামিনের এক হাজার টাকা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। অতঃপর দু'হাজার টাকা দিয়ে 'নবযুগ' পুনরায় প্রকাশ পায়। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই নবযুগ বন্ধ হয়ে যায়। ড. সুশীল কুমার গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে এ সময় সাহিত্যিক বন্ধুদের চাপে নজরুল 'নবযুগ'এর কাজ ছেড়ে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দেওঘর চলে যান। মুজফ্ফর আহমদের হাতে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে 'নবযুগ' বন্ধু হয়ে যায় জানুয়ারী মাসে। দেওঘর যাবার আগে নজরুল 'বন্ধু আমার থেকে থেকে কোন সুরের নিজনদূপুরে' গানটি রচনা করে গেয়ে শোনান। নজরুলের স্বকণ্ঠে এই গান শুনে মোহিতলাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। 'নবযুগে' প্রকাশিত সব প্রবন্ধ পরবর্তীকালে 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস্ পৃ. ৫২) এই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরেজ সরকারের শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে হওয়ায় পুস্তকটিকে ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯২২ সালে ২৬শে অক্টোবর ফৌজদারী বিধির ৯৯এ ধারা অনুসারে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর ২০ বৎসর পরে 'যুগবাণী' গ্রন্থের বিরুদ্ধে পুনরায় জনৈক সরকারি কর্মকর্তা যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন এখানে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হলঃ "I have examined the book 'yugabaini'. It breathes bitter racial hatred directed mainly against the British, preaches revolt against the existing administration in the country and abuses in the very strong language the 'slave–minded' Indians who upholds the administration. The three articles are: 'Memorial to Dyer', Who was responsible for the Muslims' massacre? and 'Shooting the Blackman' are specially objectionable. I don't think it would be advisable to remove the ban in the present crisis. On the whole it is a dangerous book, forceful and vindictive. [sd/ - Illegible, date: 16. 1.41, File no. 58 – 31/40 Home (pol)] (শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ. ১৩) স্পস্টতই, বোঝা যায় যে নজরুলের 'যুগবাণী'র প্রবন্ধ সমূহের প্রভাব কত গভীর এবং সুদূর-প্রসারী ছিল। শাসনকালের শেষ দিনগুলোতেও ইংরেজ সরকার নজরুলের 'যুগবাণী'কে বিপজ্জনক ও ভীতিপ্রদ বলে মনে করেছে। দেশের জন্য লেখনির এমন ক্ষমতা কোন কালে কোন লেখক দেখাতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। এমন যিনি, তিনি গোটা বাঙালীর জন্যই শুধু নয়, পৃথিবীর তাবৎ অত্যাচারিত এবং শোষিত মানুষের অহঙ্কার।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২২ সালে 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হওয়ার দুই বছরের মধ্যে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' এবং 'ভাঙার গান' এই দু'টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়। ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর ফৌজদারী বিধির ৯৯ এ ধারা অনুসারে উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 'বিষের বাঁশি'র প্রকাশক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম নিজে।

শিশির কর বলেন, 'বিষের বাঁশি'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি অপূর্ব্ব। একটি রিক্ত পাত্রে একজন কিশোর হাঁটু মুড়ে বসে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে জড়িয়ে আছে তীক্ষ্ণ জিহবা বিশাল বিষধর। কিশোরের ভঙ্গিতে ভাবে ভয়ের বিন্দু বিসর্গও নেই। সে তন্ময় তৎপরায়ণ হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর তার বাঁশির সুরে জেগে উঠেছে নতুন দিনের সহস্রাংশু সূর্য -- যার আর এক নাম লোকচক্ষু, লোক প্রকাশক, ছবিটা এঁকেছেন কল্লোলের সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশ, নজরুলের নিজের বর্ণনায় প্রথিতযশা কবি-শিল্পী-আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু।' (শিশির কর, প্রাগুক্ত, পৃ.১২)

'বিষের বাঁশী'কে দ্রোহাত্মক বলে প্রথম নথি লেখেন জনৈক বাঙালী তৎকোলীন বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান বাবু অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। ১৯২৪ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর 'বিষের বাঁশি' সম্পর্কে ইংরেজ সরকারকে লেখেন ঃ " I have the honour to enclose herewith a copy of a book entitled the 'Visher Vanish' (The flute of venoms) by one Kazi Nazrul Islam which was received in Bangl Library on the 21st August, 1924. The extracts translated (which also are enclosed herewith) will show that the publication is of a most objectionable nature, the writer revealing in revolution are sentiments and inciting young men to rebellion and to law breaking. The ideas, though often extremely vague, have clearly a dangerous

intent, as the profusion of such words as blood, tyranny, death, fire, hell, demon and thunder will show.

I may add that the writer was once convicted of seditions and is since being lionized by a section of people. I recommend that the attention of the Special Branch of Criminal Investigation Department may be drawn to this publication. The copy submitted herewith may kindly be returned to the office when done with.

I have ete.
AK Datta gupta
Librarian, Bangal Library.
দ্র. শিশির করঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

আমি আগেই বলেছি, বাঙালীরাই বাঙালীর শত্রু। একজন বাঙালী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত স্বতঃপ্রদ হয়ে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' সম্পর্কে ইংরেজ সরকারকে অবহিত করেন এবং বইটি সম্বন্ধে নানা কটুক্তি করে বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য ইংরেজ সরকারকে সুপারিশ করেন। অতঃপর তৎকালীন বৃটিশ বঙ্গের চীফ সেক্রেটারীকে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট নামের একজন ইংরেজ লেখেনঃ

Sir,

I have the honour to forward herewith a copy of a letter no. 559/17/24 dated the 24th September, 1924 from the Bengal Librarian to the Director of Public Instructor, Bengal, together with a copy of the enclosure on the subject of a book entitled 'Bisher Vanshi' by Kazi Nazrul Islam.

The writer was convicted last year under section 124A and 153A I.P.C and sentenced to one year's R.I. in the Dhumketu sedition case. The contents of the book, as would appear from the extracts of translations are dangerously objectionable and I recommend the immediate proscription of the same.

The Bangal Librarian's copy of the book in original is also sent herewith for reference and may be returned to him when done with. (শিশির করঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫)

পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব নজরুলের 'বিষের বাঁশি'কে ইংরেজ সরকারকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি Bengal Librarian এর কাছ থেকে বইটির একটি কপি পেয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে নজরুল ইসলাম ইতোপূর্বে 'ধূমকেতু'র দেশদ্রোহাত্মক রচনাবলীর জন্য ভারতীয় পেনাল কোড অনুসারে ১২৪এ

এবং ১৫৩ ধারায় অভিযুক্ত হন এবং এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা পান। ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর সরকারের গেজেটে এ উপলক্ষে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। অতঃপর ইংরেজ সরকারের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চীফ সেক্রেটারী এ. এন মোবারলি একটি আদেশ জারি করে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন।

সরকারকে লেখা নিম্নবর্ণিত চিঠিতে তিনি বলেনঃ

No. 17072p – the 22nd oct. 1924

In exercise of the power conferred by Section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898 as amended by the Third Schedule of the Press Law Repeal and Amended Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor of Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, whereever found, of a book in Bengali entitled 'Visher Vanshi', printed at the Bani Press, 33A Madan Mitra Lane, Calcutta and published by the author Kazi Nazrul Islam, Hooghly, and all other documents containing the matter of the said book contains words which bring an attempt to bring hatred or contempt, and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under Act, 124A, Indian Penal Code.

A. N. Moberly
Chief Secretary,
Bengal Government, (Officiating).
(দ্র.শিশির করঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)

আমরা কৃতজ্ঞ এ কারণে যে শিশির কর অনেক কষ্ট করে উপরোক্ত বিবরণগুলি কোর্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং নজরুল সম্বন্ধে তাঁর লেখাটিও নজরুল প্রতিভার মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শিশির কর তাঁর গ্রন্থে বলেন ঃ "নিষিদ্ধ করেও বইটির প্রচার বন্ধ করা যায় নি। 'বিষের বাঁশি'র সুরে দেশ যেন মাতোয়ারা। ক্রোধে শাসকগোষ্ঠীও রক্ত চক্ষু। তৎপর আমলারা। গোয়েন্দারাও। শুধু বাজয়োপ্ত করলেই হবে না। যে করে হোক বন্ধ করতে হবে এর প্রচার। নিষিদ্ধ 'বিষের বাঁশি'র খোঁজে তল্লাসী চললো। ১৯২৪ সালের ২৯শে অক্টোবর চীফ সেক্রেটারিকে লেখা টেগোর্টের চিঠিতে জানা যায় যে, ওই মাসেরই ২৩ তারিখে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালিয়ে 'বিষের বাঁশি'র ৪৪ কপি বই আটক করে। বাজয়োপ্ত 'বিষের বাঁশি'র খোঁজে যে সব অঞ্চলে তল্লাসী চলে তা হল ঃ

(১) আর্য পাবলিশিং হাউস, ১৫/১৬ কলেজ স্ট্রীট
(২) ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।

(৩) কল্লোল পাবলিশিং ২৭নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
(৪) ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
(৫) বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২৩৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
(৬) সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
(৭) বরেন্দ্র এজেন্সী, ১২/১ কলেজ স্ট্রীট
(৮) বাণী প্রেস, ৩৩ এ নং মদন মিত্র লেন।

(শিশিরকরঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭)

এ প্রসঙ্গে C.A. Tegart চীফ সেক্রেটারিকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

From : C.A Tegart Esq., CIE, MVO, JP
Commissioner of Police, Calcutta.

To : The Chief Secretary to the Government of Bengal, Political Dept. Calutta 29th oct. 1924

Sir,

With response to your endorsement no. 10724 – 27p. dated the 12nd instant, I have the honour to report for the information of Government that by virtue of search warrants issued by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta, the marginally noted places were searched by the Calcutta police on the 23rd instant. Resulting is the seizure of 44 copoies in all of the proscribed book entitled 'Bisher Banshi'. The house of the author at Hooghly was also searched, but no copy of the book was found.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
Sd, (Illeqible)
Deputy Commissioner of Police Special Branch

এ প্রসঙ্গে মুজাফ্ফর আহমদ লেখেন ঃ

"নজরুলের দু'খানা কবিতার বই-'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান'-রাষ্ট্রীয় সরকারের দ্বারা বাজেয়াফৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব ছাপা পুস্তক তো এক সঙ্গে বাঁধানো হয় না, অন্তত আগেরকার দিনে হতো না। ছাপানো ফর্মাগুলি কোন দফতরীর গুদামে ক' টন কাগজের তলায় চাপা পড়ে থাকত তা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ছাপানো

ফর্মাগুলি এইভাবে থেকে যাওয়ায় নজরুলের অনেক উপকার হয়েছিল। ১৯২৩ সালে মে মাসে আমি যে গিরেফতার হয়েছিলাম তারপরে বর্তমান উত্তর প্রদেশের নানান জেলা ঘুরে ও স্বাস্থ্যের কারণে ক' মাস আলমোড়ায় বাস করার পর আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম ১৯২৬ সালের জানুযারী মাসের ২রা তারিখে। এসে জানতে পেলাম যে নজরুলের নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানা সংগ্রহের জন্য অনেকের, বিশেষ করে যুবকদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। আমি তো বহু যুবককে এই বই দু'খানার জন্য আব্দুল হালীমের নিকট আসতে দেখেছি। নিষিদ্ধ জিনিষের জন্য মানুষের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়। আব্দুল হালীম জানত, কোন দফতরীর নিকট নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানির ফর্মাগুলি আছে। আরও অনেক যুবক নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের ব্যাপারে নজরুলকে সাহায্য করেছে, চঁচড়াঁয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। দুর্দিনে এই পুস্তক দু'খানা নজরুলের পরিবারের অনেক সাহায্য হয়েছে।' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা - মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ১৭৯) এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন ঃ "নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও নজরুলের কবিতার বই ক'টির বিক্রী বন্ধ করা যায় নি। নানা সভা, সম্মিলনে প্রায় প্রকাশ্যেই বই বিক্রী হচ্ছে। কলকাতার অলিগলি ফুটপাত তো আছেই। কিন্তু সে গোপন বিক্রীর উদার মুনাফার একটি শীর্ণ অংশও নজরুলের হাতে এসেছিল কি না সন্দেহ।" (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃ. ১৭৮)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াপ্ত হলেও তার বিক্রী বন্ধ থাকে নি। গোপনেই বেশী বিক্রী হয়েছিল। 'বিষের বাঁশী' কাব্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১। আয় রে আবার আমার চির তিক্ত প্রাণ, ২। ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহম (আবির্ভাব), ৩। ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম(তিরোভাব), ৩। সেবক, ৪। বন্দী বন্দনা গান ৫। মুক্তি-সেবকের গান, ৬। শিকল পরার গান, ৭। মুক্ত-বন্দী, ৮। যুগান্তরের গান, ৯। চরকার গান, ১০। জাতের-বজ্জাতি(জাত-জালিয়াত), ১১। সত্য-মন্ত্র, ১২। বিজয় গান, ১৩। পাগল -পথিক, ১৪। ভূত ভাগানোর গান, ১৫। বিদ্রোহীবাণী, ১৬। অভিশাপ, ১৭। মুক্ত-পিঞ্জর, ১৮। ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ), ১৯। উদ্বোধন, ২০। জাগৃহী।

কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই পাঠক সমাজে দারুণভাবে সমাদৃত হয়। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি' গ্রন্থটিকে অভিনন্দিত করে। বলেছি, 'বিষের বাঁশী' নজরুল নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৩১ সালের ১৬ই শ্রাবণে। গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ছিল। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংগা ছিল ৪+৬০ = ৬৪। মূল্য, এক টাকা ছয় আনা। সোল এজেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান ডিএম লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। 'বিষের বাঁশী'র প্রচ্ছদ আঁকেন কল্লোল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি-শিল্পী দীনেশ রঞ্জন দাশ। এটি ছিল নজরুলের তৃতীয় গ্রন্থ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'বিষের বাঁশী'র উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বাংলা আইন সভায় দাবী উত্থাপন করেছিলেন মুহম্মদ ফজলুল্লাহ ১৯৩০ সালের

আগষ্ট মাসে। 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াপ্ত হবার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১১ নভেম্বর ১৯২৪ সালে সরকার ফৌজদারি বিধির ৯৯ এ ধারা অনুসারে নজরুলের কবিতার বই 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বৃটিশ সরকার কখনো এ বই এর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নি। ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

'ভাঙার গান' রচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন কবিবন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। "১৯২১ সালে 'বাঙ্গালার কথা' (বাংলার কথা নয়) নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হয়েছিল। তার সম্পাদক ছিলেন শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ, আর সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রী হেমন্ত কুমার সরকার। দুটি নামই কাগজে ছাপা হতো। ১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গিরেফতার হয়ে জেলে গেলেন। তারপর তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী 'বাঙ্গালার কথা'র সম্পাদিকা হলেন। এই সময় তিনি একদিন দাশ পরিবারের তাঁর দেবর সম্পর্কিত শ্রী সুকুমার রঞ্জন দাশকে 'বাঙ্গালার কথা'য় ছাপানোর উদ্দেশ্যে একটি কবিতার জন্য নজরুল ইসলামের নিকট পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে পাঠালেন যে নজরুল ইসলাম তাঁর ওখানে যদি একদিন খেতে আসে তবে তিনি বড় খুশী হবেন। -------- শ্রী সুকুমার রঞ্জন দাশ কবিতার জন্য ৩/৪ দিন তালতলা লেনে নজরুল আর আমার বাসায় এসেছিলেন, না, এসেছিলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, তা আমি এখন ভুলে গেছি। মোটের ওপরে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু করেছিল। সুকুমার রঞ্জন আর আমি খুব আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে কবিতাটির লেখা শেষ করে নজরুল তা আমাদের পড়ে শোনাল। এই কবিতাটি ছিল নজরুল ইসলামের "ভাঙার গান'। (কারার ঐ লৌহ কপাট)

নজরুলের নিয়ম ছিল যে কোন কবিতা ছাপতে দেওয়ার আগে সে নিজ হাতে কবিতাটির পরিষ্কার কপি তৈয়ার করে দিত। 'ভাঙার গানের ব্যাপারেও সে তাইই করেছিল। ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে ভাঙার গান "বাঙ্গালার কথা'য় ছাপা হয়েছিল। তার আগে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখেও নজরুলের 'নবযুগ' শীর্ষক একটি গদ্য লেখা 'বাঙ্গলার কথা'তে ছাপা হয়েছিল। এটা ছিল নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। শুধু যে শারীরিক বল প্রয়োগ হতে বিরত থকতে হবে, তা নয় --- চিন্তায় লেখায় ও কথায়ও বলপ্রয়োগের প্রেরণা যোগানো ছিল নিষিদ্ধ। এসত্ত্বেও নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের নেতা চিত্তরঞ্জনের কাগজে নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান' ছাপা হয়ে গেল। 'ভাঙার গান' বিদ্রোহীর সমসাময়িক কবিতা। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বরের পরে এবং ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের আগে কোন একদিন 'ভাঙার গান' রচিত হয়েছিল। কেউ কেউ যে বলেন হুগলী জেলে 'ভাঙার গান' রচিত হয়েছিল তা সম্পুর্ণ অমূলক। নজরুল হুগলী জেলে ছিল ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর বাড়ীতে নজরুল ইসলাম একদিন খেতে গিয়েছিল এবং তাঁর অশেষ স্নেহ অর্জন করে ফিরেছিল। নজরুলকে দেখিয়ে তিনি ব্যারিষ্টার মিস্টার নিশীথ চন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, সে আদালতে অভিযুক্ত হলে মিষ্টার সেন যেন তাঁর এই ছেলেটির মামলার তদবীর করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ জেল হতে ফেরার পরে নজরুল তাঁরও স্নেহ-ধন্য হয়েছিল।

বলেছি, 'যুগবাণী' গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সে সময় ইংরেজ সরকার 'যুগবাণী'তে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধকে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার সময় উল্লেখ করেছিল। এই প্রবন্ধগুলি হলো ঃ ১। ডায়ারের স্মৃতস্তম্ভ, ২। মহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? ৩। কালা আদমিকে গুলি করে মারা। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নজরুল যে কত সোচ্চার ছিলেন তা বোঝা যায় যখন ইংরেজ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে আসেন এবং তখন দেশব্যাপী হরতাল শুরু হয়। ২১শে নভেম্বর ১৯২১ কুমিল্লাতেও হরতাল ও মিছিল হয়। নজরুল তখন কুমিল্লায়। ইংরেজ যুবরাজের আগমণের প্রতিবাদে কুমিল্লায় মিছিল হয়েছিল। নজরুল কাঁধে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গান গেয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ উপলক্ষে নজরুল সরকার বিরোধী 'জাগরণী' গান গেলেন। মিছিলে যাওয়া এবং গান লেখার জন্য নজরুলকে এক রাত থানায় থাকতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'নবযুগ' এবং 'ধুমকেতু' এই দুই পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ পেয়েছিল সে সব থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধ পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করে 'যুগবাণী', 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছিল। নজরুলের এ সব রচনাবলী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে এবং লক্ষে লেখা হলেও তা যুগকে ছাপিয়ে অদ্যাবধি টিকে রয়েছে। নজরুলের সময় যে আন্দোলন এবং লড়ায় হয়েছিল তাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই অংশ নিয়েছে। মুসলমানেরা লড়েছে নিজেদের একটা আবাসভুমির জন্য এবং হিন্দু সম্প্রদায়ও তাই; তারা চেয়েছিল হিন্দুভারত। অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলন হয়েছিল বৃটিশ সরকারের শোষণ, অত্যাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে। নজরুল এ সময় 'নবযুগ' পত্রিকায় যে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের মধ্যে কুড়িটি প্রবন্ধ 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। ১। নবযুগ, ২। গেছে দেশ দুঃখ নাই, ৩। আবার তোরা মানুষ হ, ৪। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ, ৫। ধর্মঘট, ৬। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য, ৭। মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? ৮। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ৯। ছ্যুৎমার্গ, ১০। উপেক্ষিত শক্তির উদবোধন, ১১। মুখবন্ধ, ১২। রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন, ১৩। বাঙালীর ব্যবসাদারী, ১৪। আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?, ১৫। কালা আদমিকে গুলি মারা, ১৬। শ্যাম রাখি না কুল রাখি, ১৭। লট প্রেমিক আলি ইমাম, ১৮। ভাব ও কাজ, ১৯। সত্য শিক্ষা, ২০। জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে একটা যুগ বা সময়ের কথা থাকলেও তা ছাপিয়ে বর্তমানকালেও এ সব প্রবন্ধের গুরুত্ব কমে নি। বলা যেতে পারে এ সব প্রবন্ধ

সর্বকালের পাঠককে আকর্ষণ করে। 'যুগবাণী'র প্রথম প্রবন্ধ 'নবযুগে' নজরুল শ্রমিক-বিত্তহীন সহ সকল নির্যাতিতদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলামান, এস বৌদ্ধ, এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া, প্রাণভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান-ঐ শ্মশান ভুমিতে-শোন শোন তাহাদের করুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। ঐ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্ধ মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মুক, স্তব্ধ হইয়া যাও। মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না।'

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অসাধারণ আহবান। নজরুলের দেশপ্রেম, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর রচনাবলী বাংলা সাহিত্যে এক অনুপম দৃষ্টান্ত; অন্য কোন কবি-সাহিত্যিকের রচনায় এমন ভাবনা দুর্লভ। দেশের মানুষের জন্য লিখতে গিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাঁকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর অদ্যাবধি ভারত সরকারের নিকট থেকে তিনি তেমন কোন মর্যাদা পান নি।

দেশের প্রতি অদম্য ভালবাসার পাশাপাশি শ্রমজীবি মানুষের প্রতি মমতা ও তাদের দাবী আদায়ে কবি হিসেবে অংশ গ্রহণও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। নজরুল তাঁর কবিতায় যেমন কুলি-মজুরের প্রতি নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি রাজনীতিতে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসির প্রসারের জন্যেও সরব হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমজীবিদের জয়যাত্রা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

'যুগবাণী'তে 'ধর্মঘট' নামে সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি লেখেন ঃ "দেশে একটা প্রবাদ আছে, যে এলো চষে সে রইল বসে, নাড়া কাটাকে ভাত দেও একথালা কষে।" হুলের দংশন জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বয়ং 'নাড়া-কাটা' প্রভুরাও একথাটা ভালো করিয়াই বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও যে না বুঝিবার ভান করেন বা প্রতিকারের জন্য নিজেদের দরাজ দস্ত সামলান না; ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের মনুষ্যত্বে, বিবেকে আঘাত লাগে এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুলিলেই হইল ধর্মঘট। চাষী সমস্ত বছর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেটভরিয়া মাড় ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা টেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনেও ঘটিয়া ওঠে না, ছেলে-মেয়ের শাদ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচে না, তাহারা দিনরাত্রি খনির নীচে পাতাল পুরিতে আলো

বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধুয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানীতো তাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ-হতভাগাদের স্বাস্থ্য আহার প্রভৃতির দিকে ভুলেও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নরকঙ্কাল। দোষ কাহাদের? কর্তাদের মতে দোষ অবশ্য এই হতভাগাদেরই। কারণ পেট বড়ই মুদ্দই এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে।

আমরা মাত্র এই দুই একটি নজির দিয়াই ক্ষ্যান্ত হইলাম। দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে-গুদামে 'ভাবিয়া -চিন্তিয়া মানুষ হত্যার" এইরূপ শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। আমাদের ক্ষমতা নাই যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলি।..... আজকাল বিশ্বমানবের মধ্যে Larger humanity বলিয়া একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়াছে, এই কল-কারখানার অধিকাংশ কর্তা বা কর্তৃপক্ষেরই সে দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সামনে রাত্রিদিন মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কত অমানুষিক পাশবতা তাঁহাদেরই এইসব কারখানায়, আড়তে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা নির্বাক, নিশ্চল। নিজেরা 'মজা-সে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া কুলি-মজুরের আবেদন নিবেদনকে বুটের ঠক্কর লাগাইতেছেন। সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণরূপে নিদ্রিত থাকে। যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু এই মনুষ্যত্ব-বিহীন ভোগ-বিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ আপনাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডেমোক্রাসিই সে দেশে সর্বেসর্বা; তাই শ্রমজীবি দলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম। তাহারা যে রকম মজুরী পায় তাহাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা আহারবিহার প্রভৃতির যে রকম সুখ সুবিধা, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণের অবস্থা কসাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন রক্তমাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই বুরোক্রাসি বা আমলাতন্ত্র শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখকষ্ট জর্জরিত ছিন্ন-ভিন্ন অন্তরে এমন বিদ্রোহ ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা Sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। ইহাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কত বেশী অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের

জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবি দলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্রাসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রুখিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।"

'যুগবাণী'তে প্রকাশিত নজরুলের এই বক্তব্য সে সময়ের ইংরেজ সরকার সহজভাবে নেয় নি। তারা এই বক্তব্যকে শুধুমাত্র উস্কানিমূলক হিসেবে দেখেনি, এটাকে তারা বুঝেছিল, শ্রমজীবি মানুষদের সংগঠিত করে তাদেরকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়ায়ের আহবান।

নজরুল তাঁর কাব্যে মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানুষের যারা শত্রু সেই বিত্তবান, ধনিক শ্রেণী, ভূয়া ইংরেজ সরকার -কাউকে তিনি রেহাই দেন নি তাঁর রচনায়। মানুষের প্রতি এমন গভীর মমত্ববোধ, দেশের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালবাসা, স্বাধীনতার প্রতি এমন দুর্বিণীত সাহস আর কোন কবির রচনায় প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে এমন প্রাণভরা দরদ মেশানো দুর্বার আহবান আমরা দেখতে পাই না। নজরুল ছিলেন মুক্তিকামী কলমযোদ্ধা। বৃটিশ সরকার দেশপ্রেমীদের 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু নজরুল তাদেরকে দেশপ্রেমিক হিসেবেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি তাঁদের সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন দেশের জন্য। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের প্রধান বিপ্লবী গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু তাঁর কাছে দারুণ কষ্টের ছিল। 'যুগবাণী'তে তিনি বলেনঃ "ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত- জাহ্নবী তটে দাঁড়াইয়া, আয় ভাই, আমরা হিন্দু মুসলমান কাঁধ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে হারাইয়া এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া একই লক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি।"

'যুগবাণী'তে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুল সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ উৎঘাটন করতে চেয়েছেন। হিন্দু সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের স্থান দৃঢ় করে নিয়েছেন। এর একটি কারণ মুসলমান সাহিত্যিকেরা জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন নি। প্রতি মুহূর্তে একটি হীনমন্যতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল। লেখার মধ্যে কেবল জড়তা, দীনতা, সর্বোপরি একটা প্রাণহীন চৈতন্য তাঁদের লেখায় প্রকাশ পাচ্ছিল। এই প্রবন্ধে নজরুল তাঁদের রচনাকে সমালোচনা করে তাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা ও সাহিত্য কেবল মাত্র হিন্দুর নয়, বাংলা ভাষা-ভাষি সব মানুষের এখানে অধিকার আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অংশ গ্রহণে ভাষা ও সাহিত্য এগিয়ে যাবে। দেশের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা সাহিত্যকে অগ্রসরমান হতে হবে। অনেক দেশপ্রেমী মুসলিম সাহিত্যিক জোরালো এবং প্রাণবন্ত ভাষা ও স্বভাব-প্রণোদিত গতি তাদের

লেখায় না আনতে পেরে পাঠক সৃষ্টি করতে পারে নি। নজরুল তাদের কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউ-ভরা চপলতা ও সহজমুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়।" এই গ্রন্থে নজরুল মুসলিম কবি সাহিত্যিদেরকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। ভাষাকে নিজের মতো করে নিয়ে তাকে আরো বলিষ্ঠ এবং গতিশীল করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

নজরুল আজীবন সাম্যবাদী ছিলেন। তিনি ধনী ও নির্ধনের বৈষম্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ধনীকে তিনি জাকাত প্রদান করে বিত্তহীনদের অভাব দূর করতে আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের এই মহৎ আদর্শের কথা তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে।

তবে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন বর্ণ-বৈষম্যকে। বৃটিশভারতে বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মুসলমানদেরকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে মিলে এক সাথে খেতে চায়নি, এমনকি একই মাদুরে বা চাদরের উপরেও বসতে চায় নি। মুসলমানেরা কোন হিন্দুর বাড়ীতে গেলে, তাদের চলে যাবার সাথে সাথে গঙ্গাজল বা গোবর-চোনাজল দিয়ে স্থানটি পবিত্র করা হয়েছে।

বৃটিশভারতে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে এমন বৈষম্য সে সময় তীব্রভাবে বিরাজ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদেরকে ছোটজাত হিসাবে দেখা হয়েছে। লেখা পড়া শিখবার ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। এসব বৈষম্যের কারণে হিন্দু-মুসলমান দু'টি ভিন্নজাতি এবং তাঁদের ধর্মীয় আদর্শ ভিন্ন বলে সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। নজরুলের সমকালে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই রক্তক্ষয়ী দাংগায় জড়িয়ে পড়ে। নজরুল সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কবি যিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন।

'যুগবাণী' পত্রিকায় 'ছ্যুৎমার্গ' প্রবন্ধে নজরুল এই বর্ণ-বৈষম্যের উপর তীব্র কষাঘাত করেছেন। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও এই ছ্যুৎমার্গ তীব্র এবং প্রকটভাবে বিরাজ করেছে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে 'ফারাক'ও অনেক বেশী ছিল। নিম্নসমাজের কাছ থেকে উচ্চসমাজের লোকেরা আজো জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না। এমন কি দূর্গাপুজাতেও অনেকক্ষেত্রে নিম্নসমাজের কেউ উপস্থিত থাকতে পারে না। নজরুল বলেন, "আমরা বলি কি, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে ছ্যুৎমার্গটাকে দূর করো দেখি। দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া হইয়া উঠিবে।' 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে নজরুলের চড়া গলার আওয়াজ শোনা যায়। নজরুল বলেন, "আমাদের

এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদের মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমরাও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।"

'যুগবাণী'তে তিনি দেশের মানুষের প্রতি ভেদ-বিভেদ হিংসা-বিদ্বেষ, ইত্যাদি ছেড়ে আবার যথার্থ মানুষ হতে আহবান জানিয়েছেন। তিনি হিন্দু, মুসলিম, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণ সকলকে একত্রে মিলিত হবার দীক্ষা নিতে শিখিয়েছেন। এমন সহৃদয়তা এবং মমত্ব নজরুল ব্যতিরেকে অন্য কে দেখিয়েছে? ইতোপূর্বে আমরা 'যুগবাণী' গ্রন্থটির বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। 'যুগবাণী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে, অক্টোবর ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে মোট ২১টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম কুড়িটি প্রবন্ধ স্যন্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বশেষ প্রবন্ধ 'জাগরণী' ১৩২৭ সালে (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) আষাঢ় মাসের 'বকুল' পত্রিকায় উদ্বোধন' নামে ছাপা হয়েছে। এ সময় জুন-জুলাই ১৯২২ সালে কলকতায় ওল্ড ক্লাবে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের আর্য পাবলিশিং হাউসের পরিচালক শরচ্চন্দ্র গুহের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। শরচ্চন্দ্র গুহ তাঁর প্রকাশনা সংস্থা থেকে নজরুলের গ্রন্থ প্রকাশ করতে চাইলে নজরুল তাকে 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি 'যুগবাণী' নামে প্রকাশের জন্য দেন।

কিন্তু কবে 'যুগবাণী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এ নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজফফ্র আহমদ তাঁর গ্রন্থ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ "..... তবে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। প্রকাশকদের দেওয়া একটি ছোট্ট ভূমিকার মতো তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫৭) আছে। তা থেকে খানিকটা নীচে তুলে দিলামঃ

"১৯২২ সাল আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সরকারের শোষণ ও অত্যাচারে দেশ যখন জর্জরিত, অন্য দিকে দেশবাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এই অন্যায়, অবিচার, ভীরুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দৈনিক 'নবযুগে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লেখেন। তারই কতকগুলো নিয়ে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়।"

এই ভুমিকা যাঁরাই পড়বেন তাঁরা ধরে নিবেন যে এই লেখাগুলি নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালে দৈনিক 'নবযুগে' লিখেছিলেন। অথচ ১৯২২ সালে দৈনিক 'নবযুগে'র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নজরুলের লেখাগুলি সবই ১৯২০ সালের লেখা, ১৯২০ সালেই লেখাগুলি "নবযুগে" ছাপা হয়েছিল।

"নবযুগের" গরম লেখার জন্যে পরে দু'বার কিংবা তিনবার আমাদের সতর্ক করেছিল। শেষ সর্তক করেছিল "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? শীর্ষক একটি

প্রবন্ধের জন্যে। প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের লেখা।" (মুজফফ্র আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, স্মৃতিকথা পৃ. ৩৪-৪৫)

মাহববুল হক, বলেন ঃ 'নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ যুগবাণী ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম সান্ধ্য 'দৈনিক নবযুগ' এ যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, তারই কিছু এতে গ্রন্থবদ্ধ হয়। যুগবাণী প্রকাশ করেন লেখক স্বয়ং, ৭ প্রতাপ চাটুজ্জে লেন, কলকাতা থেকে। মুদ্রকঃ কাজী নজরুল ইসলাম, মেটকাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ ২+৯২। মূল্য এক টাকা। ..... প্রকাশের প্রায় সঙ্গেই বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৪৮ সালে।" (মাহবুবুল হক, নজরুল তারিখ অভিধান, পৃ. ৫১)

মাহবুবুল হক বিরচিত নজরুল অভিধানের লেখা রয়েছে যে নজরুল জুন-জুলাই ১৯২২ সালে শরচ্চন্দ্র গুহকে তাঁর প্রকাশনা সংস্থা থেকে 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো 'যুগবাণী' নামে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। মাহবুবুল হকের নজরুলের জীবন তারিখ অভিধানে উল্লেখ রয়েছে ঃ "তারিখ ২৩শে নভেম্বর ১৯২২ 'যুগবাণী' বিস্ফোরক উপাদানে পরিপূর্ণ'-স্বরাষ্ট্র বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনে এ ধরনের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বাংলা সরকার ১৬৬৬১ পি নম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফত রাজদ্রোহমুলক প্রবন্ধ রচনা ও প্রচারণার অভিযোগে ফৌজদারি বিধির ৯৯ -এ ধারা অনুসারে নজরুলের 'যুগবাণী' নিবন্ধ সংকলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে। বইটি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও বার্মা সরকার কর্তৃক যুগপৎ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।" (মাহবুবুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২)

মুজফফ্র আহমদ নজরুলের প্রথম পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে বলেন, "আমি আমার 'কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে'তে ঠিকই লিখেছিলাম যে ১৯২২ সালের আগে কাজী নজরুল ইসলামের কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নি। অসাবধান তা বশত আমি 'ব্যথার দানে'র নামোল্লেখ করি নি। এই 'ব্যথার দান'ই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক। প্রকাশিত হওয়ার পরে তা সরকারি দফতরে প্রথম রেজিষ্টারভুক্ত হয়েছিল ১৯২২ সালের ১লা মার্চ তারিখে। ---------- কলিকতার মেট্কাফ প্রেসে প্রথমবারে, এই পুস্তকের ১১০০ কপি ছাপা হয়েছিল। দাম ধার্য করা হয়েছিল দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৪৭। এটা মনে রাখার বিষয় যে নজরুল ইসলাম তার জীবনে প্রথম গ্রন্থকার হয়েছিল এমন একখানা পুস্তকের যে পুস্তকে তার কোন স্বত্ব ছিল না।

নজরুলের "অগ্নিবীণা" ও "যুগবাণী" একই সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল। "অগ্নিবীণা" প্রকাশিত হওয়ার পরে সরকারি দফ্তরে পৌছেছিল ১৯২২ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে। প্রথম বারেই ২২০০ কপি ছাপা হয়েছিল কলকাতার মেটকাফ্ প্রেসে। দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬। প্রথম মুদ্রণে "যুগবাণী" ৯২ পৃষ্ঠার ছিল। তার দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা মাত্র। পুস্তকখানা প্রথমবারে কত কপি ছাপা হয়েছিল তা দুর্ভাগ্যবশত লিখে আনা হয় নি।

এখানে এই দু'খানা পুস্তকের প্রকাশন সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া অবশ্যক। 'সেবকের' কাজ নিয়ে নজরুল যখন কুমিল্লা হতে ফিরে এসেছিল তখন খুব সম্ভবত ওল্ড ক্লাবে শ্রী শরচ্চন্দ্র গুহের সঙ্গে দেখা হয়। শ্রী গুহের সঙ্গে আগে হতে নজরুলের পরিচয় ছিল, না, ওল্ড ক্লাবেই প্রথম তাদের পরিচয় হয়েছিল সে কথা আমি বলতে পারব না। ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও বৌবাজর স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে দোতলায় ওল্ড ক্লাবের অফিস ছিল। তারই নিকটে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে কোন এক বাড়ীতে ছিল 'শ্রী অরবিন্দ ঘোষের' আর্য পাবলিশিং হাউজ।' শ্রী শরচ্ছন্দ্র গুহ ছিলেন এই পাবলিশিং হাউজের পরিচালক। শুনেছি আগে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্রবে ডেটেনিউ ছিলেন, তবে কোন দলের লোক তিনি ছিলেন তা আমার জানা নাই। ১৯২২ সালে তিনি নিশ্চয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ভক্ত ছিলেন। তা না হলে তাঁর পাবলিশিং হাউসের পরিচালক তিনি হতে যাবেন কেন? ----- শ্রী শরচ্চন্দ্র গুহই প্রস্তাব করলেন যে আর্য পাবলিশিং হাউস হতে তিনি নজরুলের লেখা ছাপাতে চান। নজরুল তাতে রাজী হলো এবং প্রথমে 'নবযুগে' প্রকাশিত লেখাগুলি 'যুগবাণী' নাম দিয়ে সে শরৎ বাবুকে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই এই লেখাগুলি প্রেসে চলে গিয়েছিল। "অগ্নি-বীণা' প্রকাশের ভারও আর্য পাবলিশিং হাউসকেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বেশ কিছু দিন পরে। "ধূমকেতু" বার করার অনেক আগে নজরুল 'যুগবাণী'র পাণ্ডুলিপি শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহকে দিয়ে ছিল। আর "অগ্নি-বীণাতে "ধূমকেতু"র প্রথম মুদ্রিত কবিতাও আছে।

এখন সরকারি রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে "অগ্নিবীণা" ও "যুগবাণী" একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল, বরঞ্চ "যুগবাণী" সরকারি দফতরে পৌঁছেছিল "অগ্নিবীণা"র একদিন পরে; প্রকাশকদের এই বিলম্ব হয়তো ইচ্ছাকৃত। তাঁরা হয়তো "অগ্নি-বীণা" কেই প্রথম বাজারে বা'র করতে চেয়েছিলেন। "যুগবাণী" যে প্রথম প্রেসে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। "অগ্নি-বীণা" ও "যুগবাণী"র প্রথম প্রকাশক 'আর্য পাবলিশিং হাউস' হলেও প্রথম মুদ্রণের সময়ে তাঁরা প্রকাশক হিসাবে নিজেদের নাম ছাপান নি। মামলা-মোকদ্দমা হয়ে যেতে পারে এই ভয় তাঁদের মনে ছিল। কাজেই, প্রথম বারে কলকাতা, ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেন হতে কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই বাহ্যত পুস্তক দু'খানার প্রকাশকও হয়েছিল।

..... নজরুলের দু'খানা কবিতার বই "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" ---- বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা বাজেয়াফ্‌ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সব ছাপানো পুস্তক তো এক সঙ্গে বাঁধানো হয় না, অন্তত আগেরকার দিনে হতোনা। ছাপানো ফর্মাগুলো কোন দফতরীর গুদামে ক'টন কাগজের তলায় চাপা পড়ে থাকত তা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ছাপানো ফর্মাগুলি এইভাবে থেকে যাওয়ায় নজরুলের অনেক উপকার হয়েছিল। (মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, স্মৃতিকথা, পৃ.১৭৭-১৭৯)

'যুগবাণী, 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙারগান' নিষিদ্ধ হবার পর ইংরেজ সরকার 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তুতি নেয়। 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থে যে সব প্রবন্ধগুলো

সংকলিত হয়েছিল সে সব রচনাগুলি হচ্ছে ঃ ১। রুদ্রমঙ্গল, ২। আমার-পথ, ৩। মোহাররম, ৪। বিষ-বাণী, ৫। ক্ষুদিরামের মা, ৬। ধুমকেতুর পথ, ৭। মন্দির ও মসজিদ, ৮। হিন্দু-মুসলমান ।

গ্রন্থকার অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই এই গ্রন্থের প্রকাশক, ঠিকানা বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক, শ্রী অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। 'রুদ্রমঙ্গল' একটি ছোট নিবন্ধের বই ছিল। মনে হয় মামলা হবার ভয়ে নজরুল ইসলামকেই প্রকাশক হিসেবে গ্রন্থে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে সরকার মত দেয়। তারিখ ৫ আগষ্ট, ১৯২৭, তিনি লেখেনঃ I do not advise the prosecution of the author of this book under section 124-A IPC, but I do advise the forfeiture of the book under section 99-A(1) of the Criminal Procedural Code. (দ্র. নিষিদ্ধ নজরুল শিশির কর, পৃ. ৫৮)

১৭ আগষ্ট ১৯২৭ কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ফেয়ারওয়েদার নজরুলের 'রুদ্রমঙ্গল' বাজেয়াপ্ত করার জন্যে চীফ সেক্রেটারীকে পরামর্শ দেন। তিনি লেখেন ঃ In the circumstances I request that government may be pleased to proscribe the book as early as possible' ১৯২৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার এম এইস এইস মিলস এক তদন্ত প্রতিবেদনে জানান যে নজরুল 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থের ১ম সংস্করণের জন্য মাত্র ১০০ বই ছাপিয়েছেন এবং আরও ২০০ কপি ছাপাতে চান। তদন্তকারী মিলস তাঁর রিপোর্টে বলেন যে সরকার বইটি সম্পর্কে কী পদক্ষেপ নিতে পারেন তা দেখার জন্য প্রথম সংস্করণে কম ছাপা হয়েছে।

অতঃপর ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ কলিকাতার ইংরেজ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ একটি চিঠিতে 'রুদ্রমঙ্গলের' আর কোন কপি না ছাপার জন্য গ্রন্থকার কাজী নজরুল ইসলামকে সতর্ক করে দেন। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন বিধায় নদীয়ার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে নজরুলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এই চিঠিতে বলা হয় যে নজরুল ইসলাম এই সতর্কীকরণ না মানলে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

নথিতে লেখা হয় ঃ "I think we should ask DC, SB to warn the author not to publish any more copies, if he ignores to warning we can then proscribe. sd./Illegible date 18.9.1927. (দ্র. শিশির কর, প্রাগুক্ত, পৃ৫৯)। অতঃপর ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সরকার 'রুদ্রমঙ্গল' নিষিদ্ধ করার নির্দেশ না দিয়ে নথিতে শেষ মন্তব্য করা হয়, 'কোন ব্যবস্থা নয়।' ফাইল ১৩/ স্পেসাল ১-৩, তারিখ ২৯-৯-২৭। ফলে 'রুদ্রমঙ্গল' আর বাজেয়াপ্ত হয় নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১২ অগষ্ট ১৯২৭ পাবলিক প্রসিকিউটর ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার নজরুলের 'ফণীমনসা'ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য

সুপারিশ করেন। কিন্তু আইন পরামর্শক বাজেয়াপ্ত করণের পক্ষে মত না দেওয়ায় 'ফণীমনসা' কাব্যগ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করা হয় নি। (দ্র. মাহবুবুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩) এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ থেকে ৩০ আগষ্ট ১৯২৭ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার ফেয়ারওয়েদারকে জানান ঃ "Sir, With reference to your letter no 7/374c dated the 12th August, 1927 recommending the prosecution of the Bengali book entitled "Fani Mansa" by Nazrul Islam, I am directed to say that government are advised that the book does not attract the operation of Sec 124A, IPC or Sec, 99A Cr. PC and for this government are not prepared to take steps to have it proscribed or to institute a prosecution. (দ্র. শিশিরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২)

শিশির সরকার লেখেন যে পদস্থ পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দারা চাইলেও শেষপর্যন্ত 'ফণী মনসা' বাজেয়াপ্ত হয় নি।' (শিশির সরকার প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২) 'ভাঙার গান' 'ফণি মনসা'র পরে 'প্রলয় শিখা'র উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হল। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু ৪৮০ সংখ্যাক পত্রে কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারকে এই মর্মে অবহিত করেন যে নজরুলের 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থে 'দ্রোহাত্মক' কবিতা রয়েছে যা সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক। সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ও ১২৪-ক ধারা অনুসারে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তিনি ৯৯-ক ধারা অনুসারে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ পাবলিক প্রসিকিউটরের সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালীন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয়শিখা'কে ভারতীয় পেনাল কোড অনুসারে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লেখেন। এতদসঙ্গে তিনি নজরুলকেও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৯৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। অবশেষে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৯-ক ধারা অনুসারে 'প্রলয়শিখা' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে একটি সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়।

Notification

No 14087p :- 17th September 1930

In exercise of the power conferred by section 99A of a Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found of the book in Bengali entitled 'Pralay Sikha' by Kazi Nazrul Islam printed at Mohamaya Press at 193, Cornwallis Street, Calcutta on the ground that the said book contains matter which brings an attempt to bring in hatred or contempt and excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law in

British India and also promotes or attempts to promote feelings of enemity or hatred between different classes of His majesty's subjects the publication of which is punishable under section 124A and 153A of Indian Penal Code.

W.S Hopkyns
Chief Secretary, Government of Bengal.
(দ্র. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, কলিকাতা ১৩৭০)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'প্রলয়শিখা' বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে গ্রন্থটির লেখক মুদ্রক ও প্রকাশক কাজী নজরুল ইসলামকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্ট্রাব্দের ২৫ অক্টোবর ফৌজদারি বিভাগের ইনস্পেক্টর জি এম রায়কে নির্দেশ ও ক্ষমতা দেওয়াতে তিনি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। গ্রেফতারী পরোয়ানাটি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর কার্যকর করা হয়। অতঃপর রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। এ সময় ৫০০ টাকার জামিনে কবি নজরুল ইসলামকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৪ই নভেম্বর ১৯২০ কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহ' অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা ওঠে। কবির গ্রেফতারে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ সময় আনন্দবাজার পত্রিকা, 'সওগাত' সহ অন্যান্য পত্রিকায় মামলার খবর প্রচার করে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। কৃষ্ণেন্দু নারায়ন ভৌমিক, ব্রজবিহারী বর্মণ, দেব জ্যোতি বর্মণ, মতিলাল দত্ত সরকারের পক্ষে সাক্ষ প্রদান করেন। কেশবচন্দ্র গুপ্ত নজরুলের পক্ষে ওকালতি করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুশীল গুপ্ত ও সতীশ সেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে দু'পক্ষের সওয়াল জওয়াব শেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ 'প্রলয়শিখা'র জন্যে 'রাজদ্রোহ' অপরাধে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট টি রকসবার্গ (Roxburgh) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ -এ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে নজরুলকে ৬ মাসের কারাদণ্ডের আবেদন প্রদান করেন। রায়ের তারিখ ১৫/১৬ - ১২ - ৩০। অতঃপর নজরুল পক্ষের আইনজীবি সন্তোষ কুমার বসু কবির পক্ষে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি গ্রাহামের কোর্টে আপীল করলে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়। কবি নজরুল জামিনে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় প্রখ্যাত আইনজীবি সন্তোষ কুমার বসুর সঙ্গে অন্যান্য আইনজীবি মনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভোলানাথ রায়, দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরিমল মুখ্যেপাধ্যায় ও রামদাস মুখোপাধ্যায় সহযোগিতা করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'প্রলয় শিখা'যে সময় প্রকশিত হয় সেই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর লবণ সত্যাগ্রোহ আন্দোলন শুরু করেন। একদিকে নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের

অভিযোগ ও তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা, অপর দিকে গান্ধীর আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে তদানিন্তন বড়লাট লর্ড আর উইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপোষ-রফা করে ১৯৩১ সালে ৪ঠা মার্চ একটি চুক্তি করতে বাধ্য হন। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত উল্লেখ করেন, "এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, যে সব দেশসেবক কারারুদ্ধ হয়ে আছেন এবং যাদের বিপক্ষে রাজদ্রোহের মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন হয়নি তাদের সকলকে বিনা শর্তে মুক্তিদান করতে হবে। সেই অনুসারে হাইকোর্টে সরকারের তরফ থেকে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ায় নজরুল রাজদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান। নজরুল যদিও মুক্তি লাভ করেন, 'প্রলয়শিখা' রাহু কবলিত হয়েই থাকল।" (ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১)

'প্রলয়শিখা'র পর নজরুলের সঙ্গীতগ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু' রাজরোষে পড়ে। এই গ্রন্থে প্রেমনীতি, বাউলগীতি, ইসলামি গান, দেব-দেবীর স্তুতিমূলক গান থাকলেও দেশাত্মবোধক রঙ্গব্যঙ্গের গান থাকাতে সরকার এখানে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে। অতঃপর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৯-ক ধারা অনুসারে সরকার ১৪ই আক্টোবর ১৯৩১ কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতগ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু'কে ১৭৬২৫ পি নম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মারফত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ও গ্রন্থের সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগষ্ট ১৯২০ সালে নজরুলের 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বাংলার আইন সভায় মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ দাবী উত্থাপন করেন। অধ্যাপক হুমায়ন কবীরও বারবার নজরুল এবং তাঁর গ্রন্থসমুহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী তুলে আসছিলেন। নজরুলের উপর রাজদ্রোহের যে মামলা ছিল ১৯৩০ সালের ৩০শে মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে তা খারিজ হয়ে যায় এবং নজরুল অব্যাহতি পান।

'প্রলয়শিখা'র পরে যে আঘাত আসে সেটি 'ধূমকেতুকে নিয়ে। 'ধূমকেতু'র আর্বিভাব হয়েছিল বিদ্রোহ নিয়ে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল 'ধূমকেতু'। মহাত্ম গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি স্বাধীনতার লড়ায়ের আহবান জানান হয় 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে।

নজরুল বলেন ঃ " ..... সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশ বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।....."

এমন দুঃসাহসিকতা তৎকালীন কোন সাহিত্যিক কবি, বুদ্ধিজীবি দেখাতে পারেন নি। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য নজরুলের মতো এমন ভাবে নিগৃহীত এবং

কারাবরণও কেউ করেন নি। নজরুল দেশের জন্য যা লিখেছেন বৃটিশ সরকার তাইই বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছে। নজরুল ছিলেন তাদের জন্য মহাআতঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথই স্বাধীনতা ও দেশকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্রে নজরুলকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি নজরুলের 'ধূমকেতু'কে যে ভাষায় আহবান এবং আশীর্বাদ জানালেন, তা অতুলনীয় শুধু নয়, বলা যায়, তার কোন পরিমাপ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বানী ঃ

আয় চলে আয়,রে ধুমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধবেতন।

এতো শুধু আর্শীবাণী নয়। এ যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো তাঁর গুরু হয়ে এগিয়ে এলেন। নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আর্শীবাদ তাঁর জন্য আজীবন ছিল। কোন কোন সময় যদি বা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তাও কেটে গেছে। 'ধূমকেতু'র প্রকাশ কাল নিয়ে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে। মুজফ্ফর আহমদ বলেছেন ১২ আগষ্ট ১৯২২' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়েই ধূমকেতু প্রকাশ পেয়েছিল। কারো কারো মতে ১১ আগষ্ট। যাই হোক, 'ধূমকেতু' বিদ্রোহ নিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। পত্রিকার সারথি বা সম্পাদক এবং সত্বাধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক ছিলেন আফজাল-উল-হক। 'ধূমকেতু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পেল।

ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো ছিল সরাসরি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল নজরুলের লেখা কবিতা "আনন্দময়ীর আগমণে"। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় লেখাটি বা'র হবার কথা ছিল। কিন্তু কবিতাটি 'আনন্দ বাজারে' ছাপা না হওয়ায় 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছিল। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা না হওয়ার কারণ কবিতাটি সরাসরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল এবং কর্তৃপক্ষ তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

এখানে ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি পুনমুদ্রণ করা হল।

আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, - আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?
বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয় বছরী ফন্দি-কারায়,
চক্র তাঁহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায়।
.....
ঘোমটা-পরা- কলা-বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে, দূর করে দে এসব বালাই সর্বনাশী,
চাই নাক ঐ ভাং-খাওয়া শিব,নেক নিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসী।
তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে,
রক্ত-তৃষায় 'ময় ভুখা হুঁ'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে
'ময় ভূখা হুঁ'র রক্ত ক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুর বাগে শিখ সেনা তো হুঙ্কারে ঐ 'জয় আকালী'।
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মুর্তি হেরি,
দু'চোখ পুরে জল আসে মা, আর কতকাল করবি দেরী?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিস্‌নি তা ত্রেতাযুগে টলল আসন রামের দুখে।
আর এলিনে রুদ্রাণী তহু জানিনে কেউ ডাকল কিনা,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'মায় ভূখা হুঁ'র রক্ত বীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ বলিদান
চণ্ডি! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।
হঠাৎ কখন উঠল ক্ষেপে বিদ্রোহিনী ঝান্স-রানী,
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলিনে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পুজা?
পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা।
বছর বছর এ অভিনয়-অপমান তোর, পূজ নয় এ,
কি দিস আশিস্ কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
আনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।

দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দুর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেই দিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ময় ভুখ হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রানীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী।
('ধূমকেতু', ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ 'আনন্দময়ীর আগমণী' কবিতাটি 'ধূমকেতু'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ৮ই নভেম্বর ১৯২২ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে ইংরেজ সরকার পত্রিকার সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও মুদ্রাকর প্রকাশক আফজাল-উল-হকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ধূমকেতু'র ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ 'আনন্দময়ীর আগমণী' কবিতা প্রকাশিত হলে সে দিনকার 'ধূমকেতু' পত্রিকা ও ২০ অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত ১১ বৎসর বয়েসী লীলা মিত্রের লেখা 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' এর সংখ্যা দু'টি সরকারের বাজেয়াপ্ত করে। ৩২ কলেজ স্ট্রীটে 'ধূমকেতু'র অফিস থেকে আফজালুল হক গ্রেফতার হন। নজরুল সে সময় কুমিল্লায়ে ছিলেন। সেখানেই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় নজরুলের গ্রেফতারের সংবাদে কুমিল্লা শহর প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। জনরোষ এড়াতে পুলিশ নজরুলকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং কলকাতায় নজরুলকে বিচারাধীন অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। জেলে থাকতেই নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দি' নামে এক অসাধারণ বক্তব্য তৈরী করেছিলেন। এই জবানবন্দিই তিনি আদালতে উপস্থিত করেছিলেন।' রাজবন্দীর জবান বন্দী প্রেসিডেন্সী জেল থেকে তাঁকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হলে নজরুল 'কারা-শাসনে'র' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন শুরু করেন। ৩৯ দিন পর বিরজা সুন্দরীর দেয়া লেবুর শরবৎ পান করে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেন "Give up hunger strike, our literature claims you."। যদিও নজরুল যথা সময়ে এই টেলিগ্রাম পান নি, কিন্তু এই টেলিগ্রামের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের জন্য নজরুল যেমন অনেকটাই অপরিহার্য তেমনি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বেঁচে থাকাটাও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোটাবাঙ্গালী জাতির জন্য তাঁর অবদানও যে অনেক মুল্যবান, রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯২৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ এবং ১৫৩ এ ধারানুসারে বিচারপতি সুইনহো কাজী নজরুল ইসলামকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

প্রদান করেন। এ সময় 'ধূমকেতু' সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা এইচ, গ্রিনফিল্ড ১৯২৪ সালের ১৯শে জুন বাংলা সরকারের আণ্ডার-সেক্রেটারিকে 'ধূমকেতু' সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠান তা নিম্নরূপ ঃ

"Started from 11th August, 1922. Preaches emancipation from all restraints–political, social or religious, independent in tone. The late editor Nazrul was convicted and sentenced under sec. 124A and 153A I.P.C to 1 year r.i. on the 17th January 1923."

'ধূমকেতু' সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হ'তো। এটা ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক। বার্ষিক চাঁদা ছিল ৫ টাকা। প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এ থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে 'ধূমকেতু' অসম্ভব রকম জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল বিধায় ইংরেজ সরকার এর প্রচারে ভীত- সন্ত্রস্ত ছিল।

'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ নিয়েও বৃটিশ সরকার আতঙ্কিত ছিল এবং তা বাজেয়াপ্ত করার জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। বাংলা ১৩৩৩ সালে 'সর্বহারা' প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল । তখন এই কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট ২১টি কবিতা ছিল। ১৯২৫ সালে নজরুলের 'সাপ্তাহিক লাঙল' পত্রিকা শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রূপে প্রকাশিত হয়। 'সর্বহারার' বহু কবিতা এই 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সর্বহারা'র অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১৩৩২ সাল থেকে ১৩৩৩ এর মধ্যে। 'সাম্যবাদী'র অনেক কবিতা 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে 'সাম্যবাদী' স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ পায় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। 'সর্বহারা' এবং 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ দু'টি সাধারণ অসহায় মানুষ, শ্রমিক ও বিত্তহীনদের নিয়ে লেখা। নজরুল রুশ-বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু হওয়ায় সে সুবাদে তিনি কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি বস্তুত, কমিউনিষ্ট ছিলেন না। এর একটি প্রমাণ নজরুল কখনও নাস্তিক ছিলেন না। তিনি একেশ্বরবাদী এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইসলামধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এটা সত্য, তিনি আচার-আচরণে কিংবা চাল-চলনে পুরোপুরি মুসলমান ভাবাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু ছেলেবেলায় নামাজ পড়েছেন, কোরআন-হাদিস তিনি জানতেন। তিনি ইমামতী করেছেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি ইসলামের আদর্শ অনুসারে তাঁর জীবনকে যে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলেছিলেন, এমনও বলা যাবে না।

যা হোক, নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে ইসলামের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মার্কসবাদ ও ইসলামের সঙ্গে মূলত, কোন বিরোধ নেই। বিরোধ একটি, তা হলো, ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। মার্কসবাদে মানুষই সার্বভৌম। আধুনিক গণতন্ত্রেও মানুষই সার্বভৌম। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর 'খলিফা' বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং তার উপরে আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কেউ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং শক্তিধর নয়।

'সাম্যবাদী' এবং সর্বহারা কাব্যে মানুষের জয়গান করা হয়েছে। এই মানুষকেই নিয়েই নজরুল বলেছেনঃ

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান।

শিশির কর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন "সর্বহারার' প্রথম সংস্করণ বের হয় ১৩৩৩ সালের ১৬ই ভাদ্র। এর প্রচ্ছদে দুই কৃষকের ছবি- একজন হিন্দু আর একজন মুসলিম। গ্রন্থটি বিরজাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'সর্বহারা কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়ঃ

"The book 'Sarbahara' (the destitute) comes from the poem of Kazi Nazrul Islam, an ex political convict. The book contains some 21 poems and is published by Braja Behari Burman of Burman Publishing House of 193, Cornwallis street, Calcutta. The book is named 'Sarbahara' after the title of its first poem. The poem in its last stanza called upon the boatman (figuratively) to leave his boat and to take to land and to make his feet blood-stained by striking them against ground hard. Almost all the poems breathe a spirit of revolt. (File no 13 SP 1-37, 1922 Home (Pol) Confidential, Beng. Govt.)

২২ ডিসেম্বর ১৯২৬ সালে পাবলিক প্রসিকিউটর তারকানাথ সাধু ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪ক এবং ১৫৩ক ধারা অনুসারে 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারিকে পত্র লেখেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি কৃষাণের গান, ধীবরের গান, রাজা-প্রজা, ফরিয়াদি ও সর্বহারা কবিতাগুলিকে রাজদ্রোহ জাতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তারকানাথ সাধু তার বিপোর্টে বলেন ঃ

"I have gone through the book in Bengali entitled 'Sarbahara' by Nazrul Islam and published by Sri Braja Beheri Burman Roy of Burman Publishing House of 193, Cornwallis Street Calcutta and I am of opinion that the book does come within the perview of sec. 124A as well as of Sec 153A of the Indian Penal code. I would draw special attention of the poems কৃষাণের গান at the page 10 & 11, ধীবরের গান at the pages 16 to 19 and রাজা-প্রজা and ফরিয়াদি at the page 50&55. পুলিশ কমিশনার টেগার্ট 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য চীপ সেক্রেটারীকে চিঠি দেন। টেগার্ট সাহেব লেখেন ঃ

"Sir, I have the honor to forward herewith a book entitled 'Sarbahara' by Kazi Nazrul Islam, printed by Sasi Bhusan Pal at the

Metcalfe Press, Calcutta and published by Sri Braja Behari Burman Roy of Burman publishing house, Calcutta together with a copy of the review of the same by an officer of this department. The Public Prosecutor, Calcutta, whom I have consulted, is of opinion that the book comes within the purview of 124A & 153AIPC. A copy of his opinion is enclosed.

I am informed that 1200 copies of the book were printed and made over to the Publisher on 25th October last. It is said between 300 to 400 copies have been sold up to date.

I therefore, request action for the prosecution of the author, printer & publisher under sec. 124 A & 153 A IPC. (দ্র. শিশির কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৬)

এতদসত্ত্বেও চীফ সেক্রেটারী নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্য গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন নি। আমরা জানতে পারি অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হয় নি। অগ্নি-বীণা নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি নজরুল বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করে ছিলেন।

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাইত তোমার বহ্নিরাগেও বেদন-বেহাগ বাজে।

'অগ্নি-বীণা' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এমন কোন তথ্য জানা নেই। তবে পুলিশী খবরদারি ছিল। ইংরেজ সরকারের আমলে এদেশের অনেকেই চাকরী করেছেন এবং সে সুবাদে অর্থবিত্ত লাভের পাশাপাশি ইংরেজ সরকারকে তাবেদারী করেছেন। এদের অনেকে হিন্দু এবং মুসলমান ছিলেন। ইংরেজ সরকারের পদলেহন করে এঁদের অনেকে খেতাবধারী হয়েছেন। এরাই দেশপ্রেমীদের সন্ত্রাসী বানিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। এদের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার দেশের মানুষকে অত্যাচার এমন কি নিঃশেষিতও করেছে।

দেশ-স্বাধীনের আগে এ সব উচ্চবিত্ত মানুষেরা তাদের মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হয়েছেন। বাংলায় ইংরেজ সরকারের তাবেদারী মন্ত্রীপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীও হয়েছেন। নজরুল কবি হিসেবে এদের কাছেই লাঞ্ছিত হয়েছেন। মাহবুবুল হক, তাঁর "নজরুল তারিখ অভিধানে" এমন কয়েকজনের কথা বলেছেন যাঁরা নজরুলের গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করতে ইংরেজ সরকারকে যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, আবার নজরুলকেও কারাবরণ করতেও সরকারকে সাহায্য করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মাহবুবুল হকের বিবরণ ঃ

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ ঃ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হুমায়ুন কবীর নজরুলের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 'যুগবাণী' 'বিষের বাঁশী' 'ভাঙার গান', 'প্রলয়-শিখা' 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ ঃ

নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলির ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জানতে চেয়ে হুমায়ুন কবীর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নোটিশ দেন।

১০ মার্চ ১৯৩৯

নজরুলের 'যুগবাণী' 'বিষের বাঁশি' 'ভাঙারগান' 'প্রলয়-শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের উপর আরোপিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন তৎকালীন স্বরাষ্ট মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন।

২৭ আগষ্ট ১৯৪০

স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগ কর্তৃক পুলিশ কমিশনারকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কাজী নজরুলের নিষিদ্ধ বই 'বিষের বাঁশী' 'প্রলয়-শিখা' 'চন্দ্রবিন্দু', 'ভাঙার গান', এর ব্যাপারে' সরাকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পর্কিত হুমায়ন কবীরের প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে স্বরাষ্ট্রে মন্ত্রী (খাজা নাজিম উদ্দিন) সে গুলি পুনঃ পরীক্ষার অঙ্গীকার করেছেন।

১৬ জানুয়ারী ১৯৪১

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু সরকারি প্রতিবেদনে আবারও বইগুলিকে অত্যন্ত বিপদজনক বলে উল্লেখ করে নিষেধ্যজ্ঞা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করা হয়।

১৮ জুলাই ১৯৪২

বাংলা সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নজরুলের অসুস্থতার কথা জানানো হয়। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় মুখ্যমন্ত্রী নজরুলের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পাদনের দায়িত্ব তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের ওপর ন্যস্ত করেন। শ্যামাপ্রসাদ নিজে নজরুলকে দেখতে আসেন এবং তাঁরই অর্থ সাহায্যে সেই রাতে সপরিবারে নজরুল বায়ু পরিবর্তন, চিকিৎসা ও পূর্ণবিশ্রামের জন্য মধুপুর গমন করেন। সেখানে তিনি কয়েক মাস ডাঃ সরকারের চিকিৎসাধীন ছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়নি বরং দুর্বলতা বেড়ে যায় এবং মস্তিষ্ক - বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়।

১৪ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

বাংলার তৎকালীন মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী একে ফজলুল হকের নিকট নজরুলের সাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এতে 'বিষের বাঁশী' 'প্রলয় শিখা', 'ভাঙার গান', 'চন্দ্রবিন্দু' ও 'যুগবাণী' গ্রন্থের উপর সরকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়।

২৭ এপ্রিল ১৯৪৫

সরকার নজরুলের 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রত্যাহার কর নেয়।

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

'চন্দ্রবিন্দু' গীতি গ্রন্থের প্রকাশনার উপর অরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭

প্রলয়-শিখা কাব্য গ্রন্থের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রতাহৃত হয়।

৩১ মার্চ ১৯৪৭/ ২৬শে মে ১৯৪৭

গদ্যগ্রন্থ 'যুগ-বাণী'র উপর অরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

১লা এপ্রিল ১৯৪৮

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গেজেট-বিজ্ঞপ্তি (নংঃ ৮৫ পি আর) মারফত নজরুলের 'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থের উপর থেকে ব্রিটিশ রাজ আরোপিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

আমি যতদুর জেনেছি, বৃটিশভারতে নজরুলের পুস্তকাদি যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয় নি। অধ্যাপক হুমায়ন কবীর ও মুহম্মদ ফজলুল্লাহ এ বিষয়ে প্রচেষ্টা নিয়েও তারা সফল হন নি। সে সময় বাঙালী চাকুরীজীদের অনেকে নজরুলের বিপক্ষে কাজ করে ব্রটিশ সরকারের কাছে নানা খেতাব উপাধি পেয়ে স্বাধীনতার পরেও 'বহাল তবিয়তে' ঐশ্বর্য ও মর্যাদা পেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

খাজা নাজিমউদ্দিন পর্যন্ত নজরুলের কারাবরণ এবং গ্রন্থাদির বাজেয়াপ্ত করণে সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। পরে অবশ্য হুমায়ন কবীরের প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে তিনি নজরুলের গ্রন্থাদি বাজেয়াপ্ত বিষয়ে পুনঃ পরীক্ষার অঙ্গীকার করেছিলেন। যা হোক, শিশির কর, তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে নজরুল ও তাঁর বিপ্লবী গ্রন্থাদি বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। নজরুলের প্রতি তৎকালীন ইংরেজ সরকার যে অবিচার করেছিলেন এবং তাঁকে কাব্য চর্চা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, সে সম্পর্কেও নানা দলিল উপস্থাপনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। হুমায়ুন কবীর ও মুহম্মদ ফজলুল্লাহ নজরুলের গ্রন্থাদি বাজেয়াপ্ত করা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তার জন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। খাজা নাজিমউদ্দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে নজরুল গ্রন্থের বাজেয়াপ্ত করণের বিষয়ে হুমায়ুন কবীরের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃ পরীক্ষা করতে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং এ কারণে সে সময়ের পুলিশের স্পেশাল বিভাগ থেকে যে বিধি তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হয়েছিল তাঁর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

"To

The Commissioner of Police, Calcutta
Issue No. 52p
Sir,

The 27th Aug. 1940

I am directed to say that in connection with a Council question asked by Mr. Humayun Kabir at the current session of the Bangal Legislative Council for the withdrawal of ban imposed by government on certain books of Kazi Nazrul Islam, the Honorable Minister gave an undertaking to re–examine the books in question.

I am therefore, to request you to furnish this department with the marginally noted books [(a) Bisher Banshi (b) Pralay Sikha (c) Chandra-Bindu (d) Bhanger Gan] of Kazi Nazrul Islam which were proscribed by Government. They will be returned to you as soon as done with.

I have etc.
Sd. Illegible
20.8.40
(দ্র. শিবির কর, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫)

নজরুলের বাজেয়াপ্ত বইগুলি সম্পর্কে এ কে ফজলুল হক একটি নোটে যে মতামত দিয়েছিলেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নোটে বলেন ঃ

"Muslims complain and very naturally that worse books by Hindu authors have in many cases been released from proscription and they resent these orders. (শিশির কর, পৃ ৬৫)

১৯৪১ সালে ১৫ মার্চ তারিখে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের কোর্টে চুড়ান্তভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় ঃ We have failed to get copies of Bhangar Gan, Parlay Sikha and Chandra Bindu. The question of raising the ban on them is therefore, I submit academical and need not be further considered. Jugabani was proscribed in 1922 and both the L.R. and the Advocate General considered it 'seditious'. Bisher Banshi was proscribed in 1924 and also considered to be seditious.
I suggest that it would be inexpedient to remove the ban during the war and that there is in any case good ground for retaining it.
Sd. Illegible. 25.3.41

নজরুলের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাদি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হলে তৎকালীন আইন পরিষদে তা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়েছিল। মুখমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক

নিজেও এই প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমলাদের জোর বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত সরকার অনড় থাকে এবং প্রত্যাহারের দাবী মেনে নেওয়া হয় না।

দেশ স্বাধীন হবার পর নজরুলের বইগুলির বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়--একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু নজরুল তা আর বুঝতে পারেন নি। কারণ তিনি তখন বোধশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের দুঃখ হয়, এমন যে কবি, যিনি দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য যে ভাবে ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন তাতে তাঁর পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়েছিল। তিনি এ সময়ে তাঁর সন্তান বুলবুলকে হারিয়ে ছিলেন। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটেও তাঁকে পড়তে হয়েছিল, এমন কি তাঁর জীবন বিপন্ন হতে বসেছিল।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে তিনি তেমন কোন সম্মানই পান নি। তাঁকে সুকৌশলে সাহিত্যজগত থেকেও বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে নজরুলকে রাষ্ট্রীয়অতিথি হিসেবে ভারত থেকে বাংলদেশ আনা হয়। ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর মৃত্যুর আগে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ তাঁকে একুশে পদকে ভুষিত করে।

নজরুল ২৯ আগষ্ট ১৯৭৬ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। নজরুল একটি গানে নিজের মৃত্যু বিষয়ে উল্লেখ করেনঃ মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই যেন কবর হতে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই। অতঃপর তাঁর শেষ ইচছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ২১ বার তোপধ্বনি সহকারে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশে দু'দিন ব্যাপী জাতীয় শোক পালন করা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এমন যে কবি, তাঁকে কৌশলে কিছু কুচক্রীমহল সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। বাংলাদেশেও রবীন্দ্র জন্মোৎসব যে ভাবে আড়ম্বরপূর্ণ হয়, নজরুলের ক্ষেত্রে তা হয় না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠান করলেও তা অনেকটা দায়-সারা গোছের হয়ে থাকে। নজরুলের নামে ময়মনসিংহের ত্রিশালে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ঠিকই, ঢাকায় নজরুল ইন্সটিটিউটও গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে নজরুলের কোন স্থান সেখানে নেই। জাপানে, ঢাকায় ও সর্বশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে মঞ্চের উপর যে ব্যানার টাঙানো হয়েছিল সেখানে বঙ্কিম চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ বেগম রোকেয়া, জসিমউদ্দিন, শরৎচন্দ্র, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা রয়েছেন সেখানে নজরুলের কোন ছবি নেই। সম্প্রতি 'ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই' এই নামে একটি গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে। এই গ্রন্থে ১৪জন লেখকের ১৭জন বাজেয়াপ্ত বই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে

নজরুল ইসলামের 'প্রলয় শিখা' ও 'যুগবাণী' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিষ্ণু বসু এবং অশোক কুমার মিত্র। প্রকাশকাল কলকাতা ১৯৯৭। ভূমিকাতে 'বই প্রসঙ্গে' সম্পাদক দু'জন যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তারা বলেনঃ "এই সংকলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং সম্প্রাদকদের উদ্দেশ্য এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে। যে বই গুলো এখনো সহজেই পাওয়া যায় তাদের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় নি। ব্যতিক্রম শুধু কাজি নজরুল ইসলাম রচিত 'প্রলয় শিখা' ও 'যুগবাণী'। নজরুল ছাড়া এ সংকলন অসম্পূর্ণ কেননা তাঁর দীপ্তকণ্ঠ দেশবাসীকে প্রবলভাবে উজ্জীবিত করেছিল। লেখার জন্য তাঁকে কারাবরন ও করতে হয়েছিল। তাঁর অন্ততচার খানি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।'

এই ভূমিকাতে সম্পাদকদ্বয় নজরুলের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং নজরুলের গ্রন্থ বাদ দিয়ে বা এই সংকলন অসম্পূর্ণ হতো সেকথাও বলেছেন। এজন্যে আমি সম্পাদকদ্বয়কে সাধুবাদ দিই। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্ত জাতিক বঙ্গ বিদ্যা সম্মেলণে কেন নজরুলের স্থান হলো না' - বিষয়টি বোধগম্য নয়। এটাকে আমি হীনমন্যতা বলব এবং এ থেকে সংগঠকদের বেরিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবো।

মনে হয়েছে যে নজরুল আজ দুই বাংলা থেকেই নির্বাসিত হয়েছেন। দু'দেশের প্রচার মাধ্যম রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে আসছে, নজরুলের প্রতি তা হয়েছে উল্টো। অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে কিন্তু ভাগ হয় নি নজরুল। তাঁর এই অভিমত আজ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এতে নজরুলের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বা লজ্জা নেই। আমরা যারা বাঙ্গালী, এ লজ্জা আজ আমাদের সকলের, গোটা জাতির।